Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.45-56
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্র মনীষায় রাজ তপস্বী শিবাজী

রাজীব চন্দ্র পাল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
Poet Rabindranath Tagore is a strange wonder of the world. He saw the Maratha ruler Shivaji in a completely new light in his nationalist outlook. Rabindranath was moved and impressed by Shivaji's philosophy. He wrote Shivaji festival poems in the wake of Ganesh Deuskar's Shivaji festival. In Rabindranath's eyes, Shivaji is king and sage at the same time. Shivaji has secured a permanent place in Rabindra nath Tagore mind and thought as a symbol of the representative of freedom-seeking people in subjugated India. Rabindranath has portrayed Shivaji as a national hero and royal ascetic in his various works. Shivaji's thoughts, imagination, ideals seem to have inspired Rabindranath. This discussion has attempted to highlight that.

Key word: Rabindranath Tagore, Shivaji Maharaj, Shivaji Utsab, Ganesh Deuskar, Indian History, Nationalism, Humanism.

"দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীর বেশে'
দুরূহ কর্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন- অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।" [১]

বিশ্বের বিচিত্র বিস্ময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বলা এবং না বলা কোনোটারই প্রান্ত সীমায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাঁর ভিত গড়ে উঠেছিল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংযোগের ফলে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন, পুনর্মূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন অব্যাহত। তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে প্রতিষ্ঠান; তাঁকে অবলম্বন করেই বিদগ্ধ সমাজের আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের, রবীন্দ্রনাথ সকলের। নচেৎ তিনি দেড়শত বছর পরেও কি টিকে থাকতেন? কিন্তু কেন তাকে নিয়ে এত

বাগাড়ম্বর? তার উত্তর হল নিজেদেরই স্বার্থে। সবাই নিজেদের স্বার্থেই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন। এই স্বার্থ আনন্দ লাভের, এই স্বার্থ বিচিত্রের সঙ্গে মিলনের, এই স্বার্থ জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধির ও জ্ঞান অর্জনের, এই স্বার্থ আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ও সম্মেলনের।

রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যের প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁর এক একটি রচনা নিয়ে গড়ে তোলা যায় নতুন সাহিত্য ও নতুন গ্রন্থাবয়ব। তাই তাঁকে নিয়ে গবেষণার শেষ নেই; নেই অনুসন্ধিৎসার প্রান্তসীমা। এক কথায় পড়ন্ত বিকেলের গোধূলির ম্লান আলোর শিখা থেকে রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত। তিনি সততই উজ্জ্বল; তাঁর সায়াহ্ন কল্পনাতীত। রবীন্দ্রনাথ কোনো বিষয়ে লেখনি ধারণ করেন নি এমনটা ভাবাও অলীককল্পনা মাত্র। তিনি অফুরন্ত। সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে বর্তমানে তুলে আনা হয়েছে রবীন্দ্র চিন্তন ও মনন প্রসূত মারাঠাধিপতি শিবাজীর প্রসঙ্গ। জাতীয়তাবাদী ভাবনায় ভাবিত কবিগুরু কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিবাজীকে দেখেছেন, কতটুকু আদর্শায়িত হয়েছেন শিবাজীর ভাবাদর্শে বক্ষ্যমান আলোচনায় সেদিকেই আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্বের এই বহু বিচিত্র মানুষটিকে নির্মিতিতে করা হয়েছে দেবতা; ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের মানবায়ন থেকে দেবতায়ন। তাঁকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চারদিকে তাঁর স্তাবকতা করে গড়ে উঠছে রাবীন্দ্রিক সম্প্রদায় । ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এর পাশে রাবীন্দ্রিক গোষ্ঠীও উল্লেখ্যনীয়। তাঁকে মধ্যমণি করে বর্তমানের সমাজপ্রেক্ষিতে পণ্ডিতরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। দেড়শত বছর পরেও একজন মানুষের জীবন ও সৃষ্টি, তাঁর ভাব ও ভাবনা, চিন্তন ও মনন নতুন থেকে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষায়িত হচ্ছে। এটাই প্রমাণ করে যে তিনি আজও আছেন; আমদের রক্ত মাংস মেদ মজ্জার সঙ্গে বিলীন হয়ে আছেন।
এক জীবনে রবীন্দ্রনাথ এতকিছু করলেন কি করে। এখানেই শেষ নয়, অন্তরাল থেকে এখনো তিনি করছেন, করছেন মানে করাচ্ছেন। তাঁর সুনিপূণ লেখনি সম্পাতে যা এসেছে সে সবের বাইরে তিনি অন্য রবীন্দ্রনাথ। তাই অদৃশ্য জীবন দেবতার কথা বলেছেন 'চিত্রা'র 'জীবন দেবতা' কবিতায়:

"আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।" [২]

শিবাজীকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অন্য দৃষ্টিকোন থেকে। শুধু তাই নয়, তাঁর মননে শিবাজী অন্যভাবে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রসাগরে অবগাহন করে মুক্তো কুড়িয়ে আনা বর্তমান নিবন্ধের রচয়িতার পক্ষে আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। নাবিক তার সুপটু হস্ত পরিচালনা করে সমুদ্রের অথই তল থেকে সম্পদ তুলে এনে সমৃদ্ধ করে তোলেন দেশ ও সভ্যতাকে। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের কুলহীন অসীমতায় গবেষণাত্মক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে নতুন সাহিত্য। রাবীন্দ্রিক সাহিত্য নামে এই ধরনের সাহিত্যিক দৃষ্টান্তকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় শিবাজীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। প্রাক-ইংরেজ শাসনাধীন সময়কালে এদেশের মাটিতে পাঠান হুন, মোঘল উড়িয়েছে পতাকা, রচিয়েছে ধূলিজাল। বহু বৎসর ধরে শোষণের চূড়ান্তসীমায় এসে যখন ব্রিটিশরা একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে

গোটা ভারতভুমি বেদখল করে রেখেছিল; তখনও প্রান্ত থেকে সীমার উপান্তে পরাধীনতার গ্লানি বিরাজমান। কিন্তু তার প্রাককালে মোঘল শাসনাধীন সময়সীমায়ও যখন ভারতবাসী বিদেশি কতৃক বিধ্বস্ত,পর্যুদস্ত তখন শিবাজীর অভ্যুত্থান ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। পিতা শাহজী ও মাতা জীজাবাঈ -এর পুত্র শিবাজী ১৬২৭ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁর সহায় ছিল না। আবাল্য পিতৃস্নেহ বঞ্চিত শিবাজীর একমাত্র আশ্রয় ছিল মায়ের কাছে। পিতা দ্বিতীয়বার টুকাবাঈকে বিবাহ করে জীজাবাঈকে পরিত্যগ করেন। ফলত, মায়ের স্নেহই শিবাজীর জীবন পাথেয়। প্রথাগত শিক্ষায় অধিকৃত না হয়েও তিনি শৌর্যে অতুলনীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা পান। শৈশব থেকেই নানা সস্ত্র শিক্ষায় পারঙ্গম এই বীর অশ্ব চালনায়ও নিপূণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দাদাজীর পদপ্রান্ত আশ্রয় করে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ কাহিনির বীরগাঁথা শুনে সেই বয়সেই তিনি স্বাধীন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হন। অত্যন্ত সাহসীকতার সঙ্গে মারাঠা সহচরদের নিয়ে স্বকীয়তায় গড়ে তোলেন বিশাল সমর বাহিনী। একাধিক বার সুকৌশলে নানা যুদ্ধ জয় করে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন সিংহাসনে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজী এক অসাধারণ বর্ণময় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্র । এই মারাঠাবীরের জীবন কথা রোমাঞ্চক এবং নাটকীয়। সারা ভারতবর্ষে ছত্রপতি শিবাজী জাতীয় বীরের সম্মান লাভ করেছেন। বাঙালি শিবাজীকে গ্রহণ করেছে আদর্শ হিসাবে। তাঁর নাটকীয় জীবন অবলম্বনে রচিত হয়েছে বহু সাহিত্য। শুধু বাংলা নয়, ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায়ও তার প্রমাণ মেলে। সে সম্পর্কিত সাহিত্য পরিচয় ইতিহাস ও সাহিত্যের পাঠক মাত্রের কাছে অজানা নয়। তাই তার বিস্তৃত বিবরণ যত্রতত্র প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শিবাজী ও মারাঠা জাতি সম্পর্কিত রচনাগুলিই এখানে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। তবে শিবাজীর কর্মভাবনা যা রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছিল তার পরিচয় প্রথমে নেওয়া আবশ্যক।

শিবাজী বাঙালির আদর্শ বীরপুরুষ। তাঁকে আদর্শ বীররূপে বরণ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হবার স্বপ্ন দেখেছে। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকারীরা এই মারাঠা বীরের দেশপ্রেম ও স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। পূর্বে মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সুলতান বংশের অধীনস্ত প্রজা ছিল। তার পরবর্তী সময় মুসলমান শাসনাধীনকালে তারা অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ লাভ করে এবং তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের উন্মেষ হতে থাকে। মারাঠা কূলতিলক শিবাজী তাদের সঙ্গবদ্ধ করে একটি জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত করেন। তখনকার সময়কাল ছিল মুসলিম শাসনাধীন। সেই মুসলমান শাসনাধীন ভারতবর্ষে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ গড়ে ওঠে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। ফলে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষের আপামর জন-সাধারণ শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে। ইতিহাসে শিবাজী বিশিষ্ঠ স্থানের অধিকারী। আবার গোটা বঙ্গদেশ জুড়ে শিবাজী তখন একমাত্র প্রতিনিধি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় তাই শিবাজীর নাম অগ্রগণ্য। শিবাজীর ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি কোনোভাবেই মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করতে চেয়ে ছিলেন মাত্র। মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করে অস্ত্র ধারণ করলেও কোনো মুসলমান নারীর সম্মান ক্ষুন্ন করে নি। শিবাজীর জীবনে জীজাবাঈ ও গুরু রামদাস স্বামী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মারাঠা বীর শিবাজী মুসলমান শাসনাধীন ভারতবর্ষে এক গৌরবময় যুগের সূচনা করলেন। তিনি মোঘল শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তখনকার বাঙালি স্মার্তসমাজ সাহিত্যে যেমন তাঁকে রূপায়িত করেছেন, তেমনি আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর মহান কৃতিত্ব তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মারাঠাবীরের আদর্শে সকলে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই সমস্ত দিক থেকে শিবাজী রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় শিবাজী ও মারাঠা জাতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন:

ক. 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। [৩]
খ. 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধ। [৪]
গ. 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' প্রবন্ধ। [৫]
ঘ. 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধ। [৬]
ঙ. 'সতী' কাব্যনাট্য। [৭]
চ. 'প্রতিনিধি' কবিতা। [৮]
ছ. 'আদর্শ প্রশ্ন'। [৯]
জ. 'বিচারক' কবিতা। [১০]
ঝ. 'পণরক্ষা' কবিতা। [১১] প্রভৃতি

'শিবাজী উৎসব' কবিতা আলোচনার প্রাক্ কালে শিবাজী উৎসব বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনার দাবি রয়ে যায়। পার্বত্য এলাকার নেতা, বিজাপুরের জায়গীরদারের প্রায় পরিত্যক্ত পুত্র শিবাজী তাঁর সামগ্রিক ক্ষমতা দিয়ে মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তারপর ফলশ্রুতি স্বরূপ বিরাট মোঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব হয়েছিল বিঘ্নিত। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে স্বদেশীযুগে বাল গঙ্গাধর তিলকের ভাবশিষ্য সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) ১৮৯৫ খ্রি. গণপতি পূজা ও শিবাজী উৎসবের সূচনা করেন। তার নেতৃত্বে কোলকাতায় প্রথম ১৯০২ খ্রি. শিবাজী উৎসব পালিত হয়। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ শিবাজী উৎসবের উল্লেখযোগ্য পর্ব। এই উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জাগরণকে সংবদ্ধ করা। স্বদেশী যুগের হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক পটভূমিকায় এই উৎসব হিন্দু জাতীয়তাবোধের সহায়ক ও সমর্থক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উৎসবের প্রেক্ষিতে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব' (১১ ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ)। ফলত শিবাজী উৎসবের পটভূমিকায় আলোচ্য কবিতায় সমকালীন ভাবধারা যুক্ত হয়ে গিয়েছে। গণেশ দেউস্করের 'শিবাজীর দীক্ষা' গ্রন্থের ভুমিকা লিখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু বিতর্কিত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'শিবাজী উৎসব' লেখেন। দেউস্করের অনুরোধে এই কবিতা লেখার প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি লিখেছেন:

> "আজ দেউস্কর মহাশয়ের বিদ্যুৎ তাড়নায় শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি সুবিধা পান তবে তাহার এক কপি শৈলেশের কাছ হইতে লইয়া দেখিবেন।" [১২]

১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে 'কলিকাতা শিবাজী উৎসব কমিটি' তিলকের লেখা 'শিবাজী মহত্ব' নামে গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই বছরেরই ১৬ সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কবিতাটি ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ১১ আশ্বিন 'স্বদেশ' গ্রন্থভুক্ত হয়ে প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্র রচনাবলীতে বিশ্বভারতী সংস্করণে সংকলিত হয় নি। কবিতা সংকলন গ্রন্থ 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থে তা স্থান পায়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মোঘল বিরোধী মারাঠাবীর শিবাজীকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোন থেকে তুলে ধরেছেন। শিবাজী তাঁর কবিতায় আদর্শ বীর ও অবিভক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্নদ্রষ্টা এক মহীতরু হিসাবে চিত্রিত।

> "এখানেই শুরু হল সমস্যা ১৯০৪-০৫ সনের পটভূমিতে যখন হিন্দু মুসলমান অনৈক্যের সমস্যা জটিলতায় উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, যখন আত্মিক সংহতির জন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহযোগীতা কামনা করা হচ্ছিল; তখন মোঘল বিরোধী সমর নায়ক শিবাজীকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করলে মুসলমান সমাজের বিচ্ছিন্নতাবাধীদের প্ররোচিত করার বিলক্ষণ আশঙ্কা।" [১৩]

বলাবাহুল্য, তখনকার মুসলমান সমাজ কবিগুরুর এই কবিতায় আস্বাভাবিকভাবে আহত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই কবিতায় কবি হিন্দু জাতীয়তার বোধন মন্ত্র গেয়েছেন একথা সর্বাংশে গ্রহণ যোগ্য নয়। রবীন্দ্র প্রতিভার অরুণ পর্বে হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ তাঁকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছিল। এই সমস্ত মন্তব্যের দ্বারা বিচার না করে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভাবনায় অবগাহন করলেই স্পষ্ঠতই ধরা পড়ে যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার প্রান্তসীমার বাইরে। গোটা রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও জীবন তেমনটা বিস্তৃত না থাকলেও এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, তিনিই প্রথম ভারতবর্ষীয় বাঙালি মুসলমান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এ রচনায় রবীন্দ্রনাথের মুসলমান ভাবনাকে না টেনে কেবল শিবাজী সম্বন্ধে রবীন্দ্র ভাবনাকেই প্রাধান্য দেওয়া লক্ষ্য। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে প্রবেশের অবকাশ এখানে রইল না। কেবল মাত্র যারা সংকীর্ণ অর্থে রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক বলে উল্লেখ করেন, তাদের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ না করেই এখানে রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান প্রসঙ্গের দু একটি কথা তুলে ধরা গেল।

রবীন্দ্রনাথ শিবাজীকে 'রাজ তপস্বী' বলে উল্লেখ করেছেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতায়। তিনি লিখেছেন:

"হে রাজ তপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশ লক্ষ্মীরে পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত, হয়ে গেছে চির যুগযুগান্তর -তরে
ভারতের ধন।" [১৪]

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শিবাজী একই সঙ্গে রাজা ও ঋষি উপাধীতে ভূষিত হয়েছেন। হিন্দু শিবাজী ও তাঁর বিরোধী শক্তি মুসলমান- এই তফাৎ রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন নি। রবীন্দ্র মননে শিবাজী ব্যক্তিগত, ধর্মগতভাবে নয়, ঐক্যবদ্ধ মানবিক ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন-বাস্তবায়নের পথিকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শিবাজী উৎসবের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলেছেন:

> "শিবাজী উৎসব আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবোধ হইতে উদ্ভূত, শিবাজী মহারাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং শিবাজী সম্বন্ধে গৌরববোধ হিন্দুদেরই হওয়া সম্ভব, মুসলমানদের নহে; সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর কোনো বীরকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে; রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এই কবিতাটির দুর্বলতা কোনখানে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্যে তাঁহার কোনো কাব্যগ্রন্থে স্থান দেন নাই।" [১৫]

বলা আবশ্যক যে, হিন্দু শিবাজীর প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল রাজশক্তি মুসলমান। তাই 'শিবাজী উৎসব' কবিতা তখন বিতর্কিত হল সঙ্কীর্ণ ভেদ-বৈষম্যের বিচারে। কবিতাটিতে কবি শিবাজীর যে নব মূল্যায়ন করলেন তা রবীন্দ্র জীবন ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত না থাকলে বোঝা সম্ভব নয়। ব্যক্তি শিবাজীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর ভাবনা, কল্পনা ও আদর্শ। তাই আদর্শায়িত নতুন শিবাজী কবিতাটিতে উঠে এসেছেন:

"মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।" [১৬]

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, কবিতার অন্যরকম মর্মার্থও সমালোচকবৃন্দ অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু কবিগুরুর বক্তব্য হয়তো তা ছিল না। তাই আব্দুল ওদুদ যখন বলেন:

> "রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব লিখে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন কর্মে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন এবং শুভ শঙ্খনাদে জয়তু শিবাজী উচ্চারণ করে ঐ ধ্যান-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন" [১৭]

-তখন একথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ মানবতার সঙ্গে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মানবতাকেই উর্ধ্বে তুলে নিজের অভিমত দিয়েছেন। তিনি নিজেও আলোচ্য কবিতার বিরূপ সমালোচনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই কবিতা লেখার তিন মাস পর ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে 'উৎসবের দিন' নামে যে ভাষণ দিলেন তাতে 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি নতুন তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে কবি উৎসবের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ কি তা বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

> "শিবাজী উৎসবের জন্য কবিতা লিখলেন বটে, কিন্তু অন্তরে দ্বিধা থাকিয়া গেল। এই উৎসবের মধ্যে তো মনুষ্যত্বের বৃহত্তর সুর ধ্বনিত হইতেছে না। কারণ মানুষ যেদিন আপনার শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে সেই দিনই উৎসব পরিপূর্ণ হয়। তাই কবি ৭ই পৌষের দিন যে ভাষণ দান করিলেন, তাহা প্রধানত ধর্ম বিষয়ক হইলেও উহার মধ্যে সমসাময়িক সমস্যার কথা আপনিই আসিয়া গিয়াছে। দেশের ধনী ও তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত তথাকথিত নিম্ন শ্রেণি বা দরিদ্র লোকের ধন বণ্টন, অন্ন সম্ভোগ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা দেশকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিতেছে। 'স্বদেশী সমাজ' লিখিবার পর হইতে কবির মনে এইসব প্রশ্নই বারে বারে উঠিতেছে, তাই 'উৎসবের দিন' ভাষণের মধ্যে এই সমস্যার আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে।" [১৮]

'একধর্ম রাজ্যপাশে' বলে রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর যে উৎসব গান গাইলেন তাতে যে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য দেন নি, প্রবন্ধে তা পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্ম বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন, উৎসব মানে কী? কেন উৎসব পালন করা হয়? সে সমস্ত কথার তাৎপর্য 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে উপস্থাপিত করতে চাইলেন, ভারতের ইতিহাসে শিবাজী গৌরবোজ্জ্বল বীরত্ব ও মহত্বের প্রতীক। স্বপ্নদ্রষ্টা এই বীর বহুধাবিভক্ত

ভারতবর্ষকে একই বৃন্তে সূত্রায়িত করতে ছেয়েছেন। অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনের পরিকল্পনায় তিনি যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তাকেই রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত বিষাদের সঙ্গে বলতে হয় যে, শিবাজীকে অনেকে চিত্রিত করেছেন 'প্রতিভাশালী দস্যু' হিসাবে। একজন বলিষ্ঠ গৌরবময় ব্যক্তিত্বকে কালিমালিপ্ত করা আর যাই হোক না কেন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল:

> "যদি একথা সত্য হইত যে, শিবাজী প্রতিভাশালী দস্যুমাত্র তিনি নিজের স্বার্থ সাধন ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য অসামান্য কৌশল প্রয়োগ করিয়া ছিলেন, তবে তাহার সেই দস্যুতাকে অবলম্বন করিয়া কখনোই সমস্ত মারাঠা জাতি এক হইয়া উঠিত না।"

জাতির ঐক্যবদ্ধের সংঘঠক ও বীর্যবান পৌরুষকারের প্রতীক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মনে শিবাজীর উজ্জ্বল উপস্থিতি চিরদিনই ছিল। তিনি শিবাজীর প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার মনোভাব চিরকাল পোষণ করে এসেছেন। যার প্রতিফলন ঘটেছে নানা সাহিত্য রচনায়, প্রবন্ধ, কবিতায়, সমালোচনায়, উত্তর-প্রত্যুত্তর ও প্রশস্তিতে। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা ঠিক হবেনা। কবি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে শিবাজীকে নিজস্ব মননে ও চিন্তনে কল্পনা করেছেন। কেবলমাত্র হিন্দু বলেই তিনি হিন্দুবীরের স্তবগান কীর্তন করেছেন তা বলা চলে না। সেই জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে অন্য কোনো জাতিও যদি নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারত তাহলে তাদের নেতৃত্বকে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর চিন্তাভাবনার পরিচয় দিতেন। সুতরাং এক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ মানসিকতাকে দূরে রেখে কবিগুরুর বৃহত্তর ভাবনায় অবগাহন করা উচিত।

'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উৎসব কি এবং কেন পালন করা হয় সে সম্পর্কিত নিজস্ব অভিমত দিয়েছেন। উৎসব মানে মিলনক্ষেত্র, মিলনের লীলাভূমি। এই লীলাভূমিতে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করে সকলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। মানুষ সত্য থেকে কোনদিন বঞ্চিত হবে না। তাই যেখানে মঙ্গল শক্তির প্রাচুর্য সেখানেই উৎসবের জয়ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আমরা মানুষের এই সকল অবারিত সাধারণ সম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি। আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।" [১৯]

রবীন্দ্রনাথ কথিত উৎসবের মহান ভাবসত্যকে সবাই ভুলতে বসেছে। তাই কোনো কিছুই এখন ব্যক্তিগত স্বার্থ সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে যেতে পারছে না। পরিচিত গণ্ডীর ভেতরে সঙ্কীর্ণ মানসিকতা সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেছেন:

> "আজ আমরা মানব সাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্র প্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর খাদ্য প্রচুরতর আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে - কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা আমাদের দীনতা আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে এই গৃহসজ্জায় এই রসলেশ শূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্ত মঙ্গল স্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল

> আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।"[২০]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধ থেকে তা সহজেই অনুমেয়। উৎসব বলতে তিনি সমস্ত রকম স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা বিসর্জিত জনমানব কল্যাণকর মিলনক্ষেত্রকেই বুঝিয়েছেন। শিবাজী এই মিলনক্ষেত্র রচনার প্রতীক। শিবাজী যেভাবে সমস্ত দলগত অভিমত ত্যাগ করে স্বাধীন জগৎ ও জীবন কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেকথাই বলতে চেয়েছেন। তাই রবীন্দ্র মননে শিবাজী প্রসঙ্গ বার বার নানাভাবে এসেছে। কিন্তু প্রবন্ধটি পড়ে কোথাও শিবাজী সম্পর্কিত স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও সমাজে মনুষ্যত্ব যখন দ্বিখণ্ডিত, ভেদ-বৈষম্যের বেড়াজালে আটকে যাচ্ছে নির্মলতা, লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রকৃত মানবসত্তা, সেখানে উৎসবের আনন্দ-ভাবনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন বিক্ষিপ্ততাহীন এক অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনের উৎসবের কথা। ধর্ম বলতে তিনি এখানে মানব ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। আর এই মানবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরোক্ষে শিবাজীর উল্লেখ করেছেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম শান্তিনিকেতনের শিক্ষক শরৎকুমার রায় 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' বলে মারাঠা ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' প্রবন্ধটি। বস্তুতপক্ষে 'শিবাজী উৎসব' প্রকাশের পর অভিজ্ঞ মহলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাই আবারও শিবাজী ভাবনা শরৎকুমার রায়ের গ্রন্থের ভূমিকায় পাঁচ পৃষ্ঠায় উত্থাপিত হয়। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে বদ্ধ না থেকে শিবাজী উদার জীবন দর্শন ও দেশীয় রাজনীতিকে এক করে মেলাবার জন্য চেষ্টিত হয়েছেন। সমগ্র বিধ্বস্ত জাতির সম্মিলিত প্রতিনিধির প্রতীক হলেন শিবাজী। শুধুমাত্র শিবাজীর সময়কালেই নয়, তাঁর প্রাক্ কালেও বহু ধার্মিক স্মার্ত ও ধর্মীয় বীর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভেদ বৈষম্যহীন এক আদর্শ দেশ গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। শিবাজীর অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠন সেই প্রেরণা থেকে সঞ্জাত। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রীয় ধর্মচেতনকে সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়, বৃহত্তর মানবধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে ভাবতে চেয়েছিলেন। তাই ধর্মসংস্থাপনজনিত কারণে শিবাজীর মাহাত্ম্য এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আমরা নিজেদের বন্ধ্যা ও মধ্যবিত্ত মাঝারি মনের দৈন্যতায় প্রায়ই ভুলে যাই যে মাঝে মাঝে ইতিহাসের সৌভাগ্যে এমন ক্ষণজন্মা মানুষ আসেন, যারা নিজেদের প্রবল স্বভাবের বিশ্বম্ভর আবেগে সবকিছুই নতুন সৃষ্টি করে তোলেন স্বকীয় ব্যক্তি স্বরূপের রসায়নে। এরকম মানসতার প্রকাশ বৈচিত্র বিচার করতে গেলে তাই সর্বদা দরকার এক জাগ্রত কিন্তু একান্ত বিনীত মননের। শিবাজী তারই প্রতীক। তাঁর নতুন দেশ ও সমাজ গঠনের প্রেক্ষিত তাই অবশ্য স্মরণীয়। 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন:

> "দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হয়তো বাঁচাইবার জন্য বূহ্যবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।"

'আপনার একটি সঙ্গবদ্ধ স্পষ্টসত্তা' অনুভব করে ভারতে শুধুমাত্র শিবাজীই মারাঠা জাতির মাধ্যমে একটা বিশেষকালের ইতিহাসকে রক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতি মিলেই মারাঠা ইতিহাসে শিবাজীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই জনসমাজ তাঁকে কোনোদিন বিস্মৃত হয় নি। যে মূল ভিত্তি ছিল

ধর্ম, তার সঙ্গে যখন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে গেল তখনই মারাঠা ক্ষমতার ভাঙন দেখা যেতে লাগল । রবীন্দ্রনাথ তাই উক্ত ভূমিকা অংশে বলেছেন:

> "ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল, এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে - ইহাই মারাঠা - অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস।"

পাঁচ পৃষ্ঠার এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর মহত্ত্ব ও সমগ্র দেশের কাছে তার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। তাই প্রবন্ধাকারে রচিত উক্ত ভূমিকার শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবে দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।"

'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমার রায়ের কাছে প্রতিশ্রুত হয়ে লিখেছেন। আলোচনাটি শরৎকুমারের 'শিবাজী ও শিখজাতি' গ্রন্থের ভূমিকায় মুদ্রিত হয় বৈশাখ ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় চৈত্র সংখ্যায় প্রবাসীতে। রবীন্দ্রমননে মারাঠাজাতিই শুধু নয়, শিখ জাতির প্রতিও আকর্ষণ এবং অনুসন্ধিৎসা ছিল। তাই তাঁর নানা রচনায় তিনি প্রসঙ্গান্তরে শিখ জাতির পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে মারাঠা এবং শিখজাতির পতনের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে শিখ গুরুগোবিন্দ সিংহ ও শিবাজীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। শিখজাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নানা গ্রন্থ পাঠ করেন বলে রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল মহাশয় ষষ্ঠ খণ্ডের ১২৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। সেদিকে যাওয়ার অবকাশ এখানে নেই। শিবাজী সম্পর্কে রবীন্দ্র ভাবনা চিন্তাই এখানে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। আন্তরিকভাবে তিনি শিবাজীর আদর্শকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও গৌরব প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটিতেই তিনি ভারতীয় জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নিজের সঙ্গে শিবাজীর মতাদর্শকে মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনকে শিবাজী মানসপটে গেঁথে রেখেছিলেন। শিবাজী একটা বড় ধরনের অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যেই মুসলমান শাসন থেকে হিন্দুজাতি ও হিন্দু ধর্মকে উদ্ধার করে নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব কাজ করেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে শিবাজীর ব্যর্থতার কারণকে তুলে ধরেছেন। সমস্ত দেশের আপামর জনলোকযাত্রায় শিবাজী কোনোভাবেই সামগ্রিকভাবে দেশের আত্মচৈতন্যে নাড়া দিতে পারেন নি । কারণ দেশ হল মাটি ও মানুষ। তাই সার্বিকভাবে সহযোগিতার হাত না পেয়ে তিনি হলেন পরাজিত। এদেশে বার বার নানা শক্তি বিদেশী শাসনকে ভেঙে দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেশিদিন তার স্থায়িত্ব হয় নি। আর এর জন্য দায়ী সকলের অজ্ঞানতা, অনৈক্যতা ও স্বার্থমগ্নতা। তাই শিবাজীও রিক্ত, তাঁর কর্মচাঞ্চল্য কর্মক্ষমতা হয়ে পড়ে দুর্বল ও উদ্যমহীন। রবীন্দ্রনাথ তাই আলোচ্য প্রবন্ধে বলেছেন:

> "এই জন্য ভাবের বন্যা নামে, কিন্তু বালুর মধ্যে শুষিয়া যায়; তেজের স্ফুলিঙ্গ পড়ে, কিন্তু ইতস্তত সামান্য ধোঁয়া জাগাইয়া নিবিয়া যায়। এইজন্য মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বল ভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।"

আলোচ্য 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গকেও তুলে ধরেছেন। শিবাজীর পাশাপাশি গুরুগোবিন্দ সিংহের উত্থান, কর্মপ্রবণতা, উৎসাহ, বিরংসা ও ব্যর্থতা

রবীন্দ্রচিত্তকে বিচলিত করে তোলে। শিবাজীর সম্বন্ধে কবিগুরু একই মনোভাব পোষণ করেন। তাই প্রবন্ধটির পরিবর্ধিত অংশে তিনি লিখেছেন:

> "কেবল আঘাত পাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, অভিমান করিয়া, কোনো জাতি বড়ো হইতে, জয়ী হইতে পারে না- যতক্ষণ তাহার ধর্মবুদ্ধির মধ্যেই অখণ্ডতার তত্ত্ব করিবার স্থান না পায়, যতক্ষণ মিলনের শক্তি কোন মহৎ ভাবের অমৃতরসে চিরসঞ্জীবিত হইয়া সকল দিক দিয়াই অন্তরে বাহিরে তাহাকে এক করিবার অভিমুখে না লইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের কোনোও প্রতিভাশালী ব্যক্তিবিশেষের কোনো বীরত্বেই তাহাকে দৃঢ় ঘনিষ্ঠ, তাহাকে সজীব সচেতন করিয়া তুলিতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ মূলত মানবতার সঙ্গে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার দ্বন্দ্বে মানবতাকেই স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। শিবাজীর নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন কাব্যনাট্যে।'সতী' কাব্যনাট্যেও তার প্রমাণ আছে। অমাবাই যবন স্বামীর স্ত্রী। অমাবাই এর পিতা ধর্মের সংস্কারে, জাত-পাতের সঙ্কীর্ণতায় গণ্ডীবদ্ধ। তাই সে তার পিতার মনের সঙ্কীর্ণতায় বলেছে:

"যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ ? ধর্মের সে নয়।" [২১]

'সতী' কাব্যনাট্যের শীর্ষে উল্লিখিত হয়েছে- 'মিস ম্যনিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠী গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধবিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।' মারাঠী গাথা অবলম্বনে রচিত এই কাব্যনাট্যে বিনায়ক রাও চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। লোকধর্ম ও নিত্য ধর্মের বিরোধ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আলোড়িত করেছিল। যার উপাদান তিনি পেয়েছেন মারাঠী গাথার মধ্যে। 'প্রতিনিধি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই শিবাজী ও তাঁর গুরু রামদাসের প্রসঙ্গ সুচিত্রিত করেছেন। কবিতাটির শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অ্যাকওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠী গাথার যে ইংরাজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজীর গেরুয়া পতাকা 'ভগোয়া ঝেণ্ডা' নামে খ্যাত।" রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন:

> "বোম্বাই প্রদেশ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল হওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার জীবনযাত্রা ও ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল। তবে বর্তমান সময়ে পুনার হত্যাকাণ্ড, শিবাজী ও আফজল খা-বিষয়ক বক্তৃতার জন্য তিলকের কারাবাস, তাঁর মুক্তির জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রভৃতি কারণে তিনি হয়তো বিশেষ করে মারাঠী ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'প্রতিনিধি' কবিতাটি তারই ফল রূপে গণ্য করা যেতে পারে।"[২২]

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর গুরুভক্তির দৃষ্টান্তকে মহত্তর ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন। গুরু রামদাসের কাছে নিজের সমস্ত রাজ্য দিয়ে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। গুরু তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়েছেন, আবার রাজ্য ও রাজধানী ফিরিয়ে দিয়েছেন। শিবাজীর ত্যাগ তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠাই এখানে কবির মূল উদ্দেশ্য। তাই কবির অঙ্কিত শিবাজী বলেছেন:

"নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক -
প্রস্তুত রয়েছে দাস, আরো কিবা অভিলাষ-

গুরু কাছে লব গুরু দুখ।" [২৩]

'প্রতিনিধি' কবিতার প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত 'আদর্শ প্রশ্ন' রচনাংশে রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর উল্লেখ করেছেন। আদর্শ প্রশ্ন কয় ধরনের হওয়া উচিত তার দৃষ্টান্তে তিনি 'প্রতিনিধি' কবিতায় কবির প্রিয় শিবাজীর কথা বলেছেন:

"এ কবিতায় শিবাজীর প্রতি তাঁহার গুরু রামদাসের উপদেশের মর্ম ব্যাখ্যা করো"[২৪]

এরপর আবার উল্লেখ করতে হয় 'বিচারক' কবিতাটি। পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত 'চরিতমা' থেকে কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখেছেন। এখানেও তিনি মারাঠা ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। পরোক্ষভাবে শিবাজীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এখানে রয়েছে রঘুনাথ রাও ও ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর মাধ্যমে ন্যায় ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কবি। 'কথা' কাব্যের 'পণরক্ষা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ মারাঠা ইতিহাসের সঙ্গে রাজপুত কাহিনিকে এক করে দিয়ে রাজস্থান কাহিনির সঙ্গে শিবাজী তথা মারাঠাজাতি কবিতাটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ঐতিহাসিক পত্রাবলী' নামে প্রবন্ধের পত্রগুলো পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন সেখানেও শিবাজীর প্রসঙ্গে মারাঠা জাতি ও স্বদেশ তথা ভারতবর্ষকে একসূত্রে গেঁথে তোলার কথাই বলেছেন। শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণীত রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন:

> "প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে মারাঠা রাজত্বকালে পত্র ব্যবহারের ভাষা মারাঠী এবং রাজপুরুষদিগের পদবী সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা হইতে শিবাজীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বজাতিকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, ভাষার স্বাধীনতা, আচারের স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতা তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। যাবতীয় বন্যা প্লাবন হইতে স্বজাতিকে তাঁহারা প্রাচীন মহত্ত্বের তীর তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব যে একটা খাপছাড়া ভুঁইফোঁড় আকস্মিক উৎপাত, এরূপ ভাবনা তাঁহাদের পক্ষে অশান্তিক- সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাচীন স্বজাতীয় মহৎ আদর্শের সহিত আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া একটি ধ্রুব প্রতিষ্ঠার উপর আপন গৌরব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়া ছিলেন। প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা মারাঠী ইতিহাসের প্রধান গৌরব নহে, কিন্তু এই নববীর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বৃহৎ ভাবের অভ্যুত্থান স্বজাতীয় আদর্শলাভের জন্য জাগ্রত হৃদয়ের প্রবল আবেগ - ইহাই শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়।"[২৫]

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্র ভাবনার জগতে শিবাজী অত্যন্ত উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ও শিবাজীর প্রসঙ্গ উত্থাপন নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে তাই রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র রচনাবলী এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির (তথ্যসূত্র অংশে উল্লেখিত) সহায়তায় এই আলোচনার সূত্রপাত। তদুপরি শিবাজী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এযাবৎ কাল পর্যন্ত নানা ভ্রান্তি প্রচলিত রয়েছে। তাই বিষয়টি নিয়ে আবারও আলোচনা করার অবকাশ থেকেই যায়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এত বিস্তৃত ও ব্যাপক যে, তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবুও স্বল্প পরিসরে বিষয়টি এখানে উপস্থাপিত হল।

তথ্যসূত্র:

১. 'উৎসবের দিন', রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী পৌষ-১৪১৭, পৃ. ৪৯০।
২. 'অন্তর্যামী', 'চিত্রাকাব্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী সং পৌষ-১৪১৭, পৃ. ১৫৮।
৩. 'শিবাজী উৎসব', সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সং ভাদ্র-১৪১১, পৃ. ৪৭৫।

৪. 'উৎসবের দিন', 'ধর্মগ্রন্থ' রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী সং পৌষ-১৪১৭, পৃ. ৪৮৫।
৫. 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি', 'ইতিহাস' গ্রন্থ, ১৩৬২।
৬. 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ', ভূমিকা রূপে 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থে শরৎকুমার রায়, বৈশাখ - ১৩১৭।
৭. 'সতী', 'কাহিনী', বিশ্বভারতী সং ১৩৬৫।
৮. 'প্রতিনিধি', 'কথা কাব্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং পৌষ-১৪১৭, পৃ. ২১।
৯. 'আদর্শ প্রশ্ন', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং পৌষ-১৪১৭, পৃ. ৫০৪।
১০. 'বিচারক', 'কথা' কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং পৌষ-১৪১৭, পৃ. ৭৪।
১১. 'পণরক্ষা', তদেব, পৃ. ৭৬।
১২. 'রবিজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন -১৪১৭, পৃ. ২০২।
১৩. 'রবীন্দ্রনাথ', রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব', অরবিন্দ পোদ্দার উচ্চারণ, ১৯৮২, পৃ. ১১৩-১১৪।
১৪. 'শিবাজী উৎসব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৭।
১৫. 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী সং, ১৯৬১, পৃ. ১২৭।
১৬. 'শিবাজী উৎসব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮০-৪৮১।
১৭. 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল ওদুদ, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৩৫১-৩৫২।
১৮. 'রবীন্দ্রজীবনী' পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮।
১৯. 'উৎসবের দিন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯।
২০. 'উৎসবের দিন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৯।
২১. 'সতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।
২২. 'রবিজীবনী', চতুর্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ পৃ. ১৫৬।
২৩. 'প্রতিনিধি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।
২৪. 'আদর্শ প্রশ্ন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৪।
২৫. 'রবিজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।